DEPARTMENT OF BENGALI

LIST OF STUDENTS: 24

1. ANANYA HAZRA
2. ANKHI DUTTA
3. ANKITA LAHA
4. ANUP KUMAR SAHA
5. BRISTI HAZRA
6. GOURI GHOSH
7. JEWEL MAJI
8. KOUSHIK MONDAL
9. MADHUMITA DHIBAR
10. MALLIKA KUNDU
11. MOSSAMAT SEMIMFINE MALLICK
12. MUNGLI MARDI
13. OSMA KHATUN
14. PARBITA MAL
15. PRANATI MONDAL
16. PRITHA NANDI
17. RINKI KHATUN
18. SABANA KHATUN
19. SANCHITA AINCH
20. SATARUPA PAL
21. SHIBARAM DEY
22. SHILPA KONAR
23. SHRAYA KHAN
24. USHA MARANDI

TITLE OF THE PROJECT:

PRACHIN- O- MADHYA JUGER SAHITYA

DURATION WITH DATE:

ONE MONTH (FROM 12.07.2023 TO 11.08.2023)

PROJECT WORK COMPLETION CERTIFICATE:

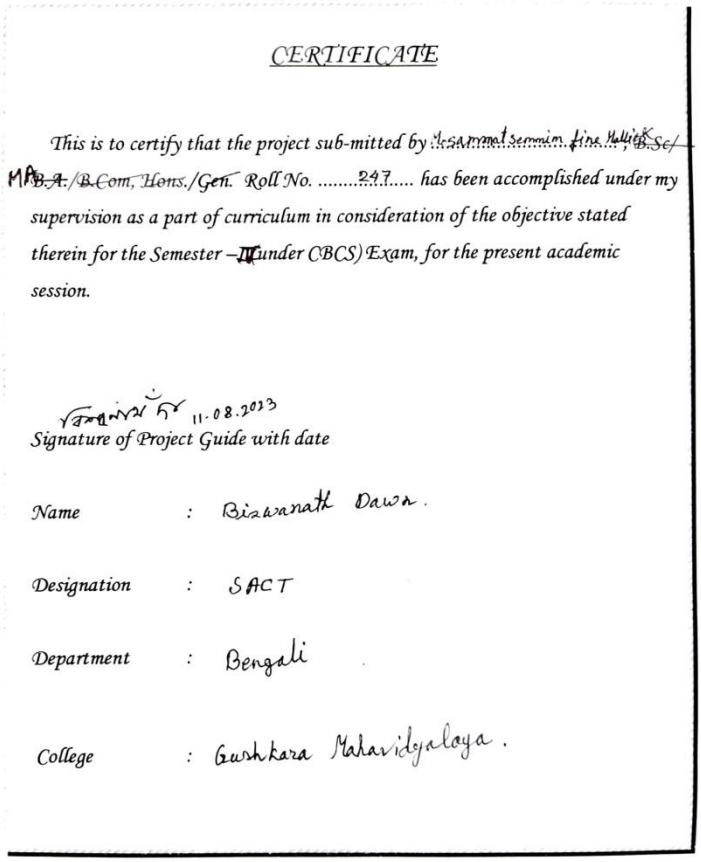

CERTIFICATE

This is to certify that the project sub-mitted by Mosammat semim fine Mallick *B.Sc/ MA ~~B.A.~~/~~B.Com, Hons./Gen.~~ Roll No.* ....247..... *has been accomplished under my supervision as a part of curriculum in consideration of the objective stated therein for the Semester – III (under CBCS) Exam, for the present academic session.*

[illegible] 11.08.2023
Signature of Project Guide with date

Name : Biswanath Dawn.

Designation : SACT

Department : Bengali

College : Gushkara Mahavidyalaya.

REPORT OF THE PROJECT WORK: (PDF OF THE REPORT OF THE STUDENT)

1. **PDF OF MOSAMMAT SEMIM FINE MALLICK**

PERMISSION LETTER FOR FIELD WORK FROM COMPETENT AUTHORITY: PROJECT WORK IS TO BE PERFORMED AS PER THE SYLLABUS OF M.A. IN BENGALI, BURDWAN UNIVERSITY.

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

গুসকরা মহাবিদ্যালয়

বিভাগ- বাংলা

বিশেষ পত্র - প্রাচীন ও মধ্যযুগ

পত্র-৪০৫

বিশেষ পত্র কেন্দ্রিক প্রকল্প পত্র

: বিষয় :

মৈমনসিংহ গীতিকার নির্বাচিত পালায় প্রেম ও বিচ্ছেদ মুল্যায়ন

নাম - মোসাম্মোৎ সেমিম ফাইন মল্লিক

স্নাতকোত্তর চতুর্থ সেমিস্টার

রোল - BUR/BENG/2021 নম্বর - 247

রেজিস্ট্রেশন নম্বর - 201801025188 OF 2018-2019

বর্ষ -২০২১ -২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা সংখ্যা

১. কৃতজ্ঞতাস্বীকার

২. ভূমিকা ৪

৩. প্রথম অধ্যায় ৫-৭

(মৈমনসিংহ গীতিকা :পল্লী চরিত্রের সমন্বয়ে মানবিক প্রেমের জয়)

৪. দ্বিতীয় অধ্যায় ৮-১০

(মহুয়া- মলুয়া-চন্দ্রাবতী- ত্রয়ী নারী সত্তার প্রেমপর্যায় ও বিচ্ছেদ ;
সাদৃশ্য- বৈসাদৃশ্য)

৫. তৃতীয় অধ্যায় ১১-১২

(সুনাই এবং মদিনা; নায়িকাদ্বয়ের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে প্রেম ও সতীত্ব রক্ষা)

৬. চতুর্থ অধ্যায় ১৩-১৪

(মৈমনসিংহ গীতিকায় নারীবেদনার অন্তরালে পুরুষ মনস্তত্ত্ব)

৭.উপসংহার ১৫-১৭

৮. তথ্যসূত্র ১৮

৯. গ্রন্থপঞ্জি ১৯

২০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলা সাহিত্যে আদি মধ্যযুগ এমন একটি সময়কাল যেখানে নানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ উপহার হিসেবে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। তেমনি একটি গ্রন্থ হল দীনেশচন্দ্র সেন বিরচিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা '। এই গীতিকার পালাগুলি পড়তে গিয়ে দেখেছি প্রায় সকল পালাগুলিতেই প্রেমকে দেখানো হয়েছে এবং সেই প্রেমের পথে বাঁধা সৃষ্টি হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে।যেটা আমাকে উৎপীড়িত করেছে।তাই নির্বাচিত কিছু পালা নিয়ে প্রেম ও বিচ্ছেদ মূল্যায়নের প্রতি আগ্রহী হয়ে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

আমার এই প্রকল্প রূপায়ণের কাজে নিরন্তর পরামর্শ দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন গুসকরা মহাবিদ্যালয়ের আমার বিভাগের অধ্যাপক মাননীয় বিশ্বনাথ দাঁ মহাশয়। এছাড়াও আমার বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকার আকুন্ঠ প্রেরণা জুগিয়েছেন প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে। এছাড়াও মাননীয় অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাঁ মহাশয় আমাকে নানাভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাই আমি তাঁর প্রতি এবং আমার বিভাগের সকল অধ্যাপকদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্বনাথ দাঁ 11.08.2023 মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরী

তত্ত্বাবধায়কের সাক্ষর বিভাগীয় প্রধানের সাক্ষর

ধন্যবাদ সহ

মোসাম্মোৎ সেমিমফাইন মল্লিক

ভূমিকা

কোনো সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে দুটি ধারাকে কেন্দ্র করে। একটি মৌখিক ধারা অপরটি লেখ্য ধারা। যে সাহিত্য মানুষের মুখে মুখেই সৃষ্টি এবং কালান্তরে প্রবাহিত হয়ে থাকে অধুনিক সংজ্ঞায় তাকেই লোকসাহিত্য বলে। এই লোক সাহিত্যের এক আনন্য দৃষ্টান্ত ময়মনসিংহ গীতিকা।

ময়মনসিংহ গীতিকা ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাচীন পালাগানের সংকলন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা থেকে স্থানীয় সংগ্রাহকদের সহায়তা নিয়ে প্রচলিত এই পালাগান গুলো সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে ময়মনসিংহ গীতিকা নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।গ্রন্থটির বিষয় মাহাত্ম্য ও শিল্পগুনে শিক্ষিত মানুষেরও মন জয় করে।

মৈমনসিংহ গীতিকায় ১০ টি পালা বা গীতিকা স্থান পেয়েছে। যথাঃ-'মহুয়া','মলুয়া','চন্দ্রাবতী','কমলা','দেওয়ান ভাবনা','দস্যু কেনারামের পালা ','রূপবতী','কঙ্ক ও লীলা', 'কাজলরেখা ','দেওয়ানা মদিনা '।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় বেশিরভাগ পালায় নায়িকাদের নাম অনুসারে। আর এইপালায় নয়িকারা আবহমান বাঙালি ঐতিহ্যর এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি। এখানে নায়িকাদেরকে আমরা এক প্রতিবাদী নারী রুপে দেখতে পায়। এছাড়া ও এই গীতিকার পালাগুলিতে নায়ক ও নয়িকার প্রেমের প্রকাশ ও প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রেম এমন একটা জিনিস যায় কোনো সংজ্ঞা হয় না। প্রেমকে বুঝতে গেলে অনুভূতির মাধ্যমে বুঝতে হয়। মধ্যযুগের নায়িকা চরিত্র গুলোর সঙ্গে মৈমনসিংহ গীতিকার প্রত্যেকটি নারী চরিত্রই প্রেমভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। ব্যাক্তিমানসজাত সেই প্রেমের নিষ্ঠাই তাদের মধ্যে প্রকাশ ঘটেছে। শুধু যে প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে এমন নয়,সুগভীর বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনি গুলোয় দেখতে পায়,যেটা নায়ক - নায়িকার বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহুয়া তার অভিশপ্ত জীবনের রক্তাক্ত পরিণতির মধ্যে,মলুয়া তার স্বজন বিতাড়িত জীবনের দুর্ভাগ্যের অন্তিম মুহূর্তে, চন্দ্রাবতী তার জীবনের নৈরাশ্য,আর মদিনা পালায় তার অনন্ত প্রতীক্ষার মধ্যে এই জিজ্ঞাসাই তুলে ধরেছে, দেওয়ান ভাবনা পালায় সুনাই এর

আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে আমরা মৈমনসিংহ গীতিকার নায়ক ও নায়িকার মধ্যে মধ্যে প্রেমভানার প্রকাশ ঘটেছে। আর এই প্রেমের পথে যে বাঁধার সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো তাদের বিচ্ছেদের কারণ হয়েছে এই সব কিছুই তুলে ধরেছে গীতিকায়।মৈমনসিংহ গীতিকার দশটি পালার মধ্যে 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী' 'দেওয়ান ভাবনা' 'দেওয়ানা মদিনা' এই পাঁচটি পালার মধ্যে যে প্রমের সঞ্চার ঘটেছে এবং এই প্রেমকে টিকিয়ে রাখার পথে যে বাধা বা বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছে সেটা আলোচনা করাই হচ্ছে আমার গবেষণা সৌন্দর্ভের বিষয়।

প্রথম অধ্যায়

(মৈমনসিংহ গীতিকাঃ পল্লী চরিত্রের সমন্বয়ে মানবিক প্রেমের জয়)

মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পায় ; প্রত্যেকটি পালায় নায়ক নায়িকারা যেন গ্রাম বাংলার মানুষ। পল্লীজীবনের মাধুর্য মিশ্রিত হয়ে মানবিক প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে।

'মৈমনসিংহ গীতিকা ' বঙ্গদেশে অপরাপর স্থানের সাহিত্যের মতো নয়।এখানে শাস্ত্রের অনুশাসন বাঙালির ঘরগুলিকে এতটা আঁটাআঁটি করে বাঁধেনি। পাষানচাপা অত্যাচারের ফলে প্রেমে বিদ্রোহবাদের সৃষ্টি হয়নি। এখানে ঘরের জিনিসকে শিকল দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখবার চেষ্টা দেখা যায় না, এবং রমনীদের জন্য পিঁজরাও তৈরি হয়নি। এখানে প্রেমের জয়গান এবং নারীর ব্যক্তিত্ব,আত্মবোধ, স্বতন্ত্র ও সতীত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এতে প্রকাশমান।গীতিকার নায়িকারা অপূর্ব প্রেম শক্তির অধিকারিণী হয়ে তাদের নারীধর্ম ও সতীত্ব রক্ষা করেছে। প্রেমের জন্য দুঃখ, তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি সর্বসমার্পন করে নারী যে কী অসীম মহিমা লাভ করতে পারে, গীতিকাগুলি তারই পরিচারক। পল্লী কবির সহজ সরল দৃষ্টি শ্বাসত নারীর অকৃত্রিম রূপ এখানে ফুটে উঠেছে। চরিত্রগুলো নিজের অঞ্চলের প্রাকৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের স্বভাবের মাধুর্য ও সৌন্দর্যের সাথে সর্বসংস্থান মুক্ত প্রেমের বিকাশ ঘটেছে। পল্লীসমাজকে প্রতিফলিত করে নায়ক নায়িকার প্রেমকে উচ্চপদে স্থান করে দিতে চেয়েছেন।

গীতিকাগুলোর মধ্যে মহুয়া পালাটি বেদের এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা মহুয়ার সাথে বামনকান্দা গ্রামের জমিদার ব্রাহ্মণ যুবক নদের চাঁদের দুর্জয় প্রণয় কাহিনি অবলম্বনে রচিত। পল্লীকবি দ্বিজকানাই আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে এই বিষাদান্তক প্রণয় কাহিনি বর্ণণা করেছেন এবং এতে কবির সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে প্রেমের জয়কেও দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালাগুলির মধ্যে পল্লী চরিত্রের সমন্বয়ে মানবিক প্রেমের জয় দেখানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ানা মদিনা ' পালার একটি পদ স্মরণীয় -

"ক্ষেত না পেকিয়া খসম যখন দেয় গুচ্ছি।
ভাত না রাখিয়া তার লাগ্যা থাকে বসি ।।
জালা আগুয়াইয়া দেই ক্ষেত্রের কাছেতে।
কত তারিপ করে খসম আসিয়া বাড়ীতে"।।[৯]

এই উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে প্রেমকে দেখানো হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে বিল ও ভড়াগ, সর্পব্যাঘ্রসংকুল অরণ্যভূমি,কুড়া পাখির গুরুগম্ভীর শব্দে আনন্দিত আকাশ,এইসব কিছুই আমাদের একান্ত পরিচিত ও প্রিয় হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র পল্লী নয়, পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত নায়ক নায়িকার প্রেমই প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। আবার প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে কবিরা এই অঞ্চলের পল্লীপ্রকৃতিও নিখুঁত রূপে চিত্রিত করেছেন। তাই বলা যায় পল্লী প্রকৃতি ও মানব প্রেম এক সঙ্গে প্রতিফলিত হয়ে পালাগুলি সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(মহুয়া – মলুয়া- চন্দ্রাবতী – ত্রয়ী নারী সত্তার প্রেমপর্যায় ও বিচ্ছেদ ,সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য)

গীতিকাগুলি নায়িকা, নায়ক প্রধান নয়।এবং এগুলো হলো প্রেমমূলক গীতিকা,তাই আমরা আলোচনা করে দেখবো মহুয়া, মলুয়া,চন্দ্রাবতী ত্রয়ী নারী সত্তার প্রেম ও বিচ্ছেদ কিভাবে ঘটেছে।

'মহুয়া' পালায় আমরা দেখি তখনকার দিনে চোর ডাকাতদের উপদ্রব ছিলো।একদিন গারো পাহাড়ের ওপর হিমানী পর্বতের উত্তরে বসবাসকারী হুমরা বেদের দল এক ব্রাহ্মন পরিবারে চুরি করতে গিয়ে, সেখানে ছয় মাস বয়সের এক কন্যার রূপ দেখে সেই কন্যাকে চুরি করে নিয়ে আসে। রূপ দেখে হুমরা বেদের স্ত্রী সেই ছোট্ট কন্যার নাম রাখেন মহুয়া সুন্দরী।তার তার বয়স যখন ষোলো তখন তার উপচে পড়া রূপ,যে দেখে সেই পাগল হয়ে যায়। এমনি তার রূপের ঐশ্বর্য ফুটে ওঠে।

মহুয়া বয়ঃপ্রাপ্তা হয়ে বেদেদের নানা প্রকার ক্রীড়াকৌশল আয়ত্ত করলো। হুমরার দলের সঙ্গে সেও খেলা দেখতে শুরু করলো। একদিন তারা খেলা দেখানোর উপস্থিত হলো বামনকান্দা গ্রামে। সেখানকার গ্রামের তালুকদার ব্রাহ্মণ যুবক নদের চাঁদ জননীর অনুমতি নিয়ে বেদেদের তামাসা প্রদর্শনে নিযুক্ত করলো এবং খেলা দেখানোর সময় মহুয়া ও নদের চাঁদের প্রথম দেখা হলো। মহুয়ার রূপ দেখে নদের চাঁদ মুগ্ধ হয়ে গেল। তাই মহুয়া যেন তার চোখের আড়াল না হয় সেই জন্যই তাদেরকে বাড়ি ও জমি দিয়ে সেখানে বসত করালো। এরপর জলের ঘাটে নদের চাঁদ ও মহুয়ার পারস্পরিক দেখাশোনার মধ্যে দিয়ে পূর্ব রাগের সঞ্চার হল-

"জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।

হাসি মুখে কওনা কথা সংগে নাই মোর কেউ"।।[১]

এরপর আসতে আসতে প্রেমের সঞ্চার ঘটে তাদের মধ্যে। নদের চাঁদের মনে যে গভীর প্রেমের সঞ্চার ঘটে এবং সে কথা মহুয়াকে বলে, তোমার মতো নারী পেলে আমি

বিয়ে করতে রাজি।এরপরেই পারস্পরিক প্রেম নিবেদনের অমর ভাষাচিত্র আমরা দেখতে পায়-

"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর"।।[২]

এই উক্তির মধ্যে দিয়ে মহুয়ার অব্যাক্ত প্রেম ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

আবার আমরা দেখি যখন মহুয়া ও নদের চাঁদের প্রেম ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তখন মহুয়ার বাবা হুমরা বেদে সেকথা জানতে পারে এবং মহুয়াকে নিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এখানে তাদের মধ্যে সাময়িক কালের জন্য বিচ্ছেদ ঘটেছে সেটা আমারা একটা উক্তির মধ্যে দিয়ে জানতে পারি -

"যাইবার কালে একটি কথা বল্যা যাই তোমারে।
উত্তর দেশে যাইও তুমি কয়েক দিন পরে"।।[৩]

এখানে কবি বিচ্ছেদকে দেখিয়েছেন।

পরবর্তীতে আমরা দেখি নদের চাঁদ মহুয়াকে খুঁজতে বার হয় এবং অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে পায়।আবার তাদের দুজনের মধ্যে মিলন ঘটে। তাদের প্রেম গভীর হতে না হতেই, সেই খবর পায় হুমরা বেদে। তাই সেখানে গিয়ে মহুয়াকে একটি বিষমাখানো ছুরি দেয় নদের চাঁদকে মারার জন্য। কিন্তু মহুয়া তা করতে পারে না,বরং তারা দুজনে ঘোড়ায় চড়ে সেখান থেকে চলে যায়। এখানে তাদের প্রেমকে বা প্রেমের জয়কে দেখানো হয়েছে।

এরপর আবার তাদের মধ্যে বিচ্ছেদকে দেখানো হয়েছে, যে কীভাবে এক সাধুর ডিঙায় ওঠার ফলে, সাধুর মনে মহুয়াকে দেখে লালসা জাগে এবং সেই সাধু নদের চাঁদকে ঠেলে ফেলে দেয় নদীতে। তখন মহুয়া আর্তনাদ করে বলে উঠলো -

"যে ঢেউয়ে ভাসাইয়া নিল আমার নদীয়ার চান।
সেই ঢেউয়ে পড়িয়া আমি তেজিবাম পরান"।।[৪]

এখানে তাদের মধ্যে সাময়িক সময়ের জন্য বিচ্ছেদ দেখানো হয়েছে।

মহুয়া বুদ্ধি করে সেই সাধুর থেকে নিজেকে রক্ষা করে ও নদীতে ঝাপ দেয়। নদীর জলে থেকে নদের চাঁদকে খুঁজে বের করে এবং তার সেবা করে তাকে সুস্থ করে তোলে।কিছুদিন পর তারা এক বনের মধ্যে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে দুজনে মিলে সুখে বাস করতে থাকে। এখানে তাদের প্রেমের জয় দেখানো হয়েছে।

কিন্তু এ সুখ তাদের সহে না।হুমরা তাদের খোঁজ পায় এবং সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়।আবার মহুয়াকে নর্দেশ দেয় বিষমাখা ছুরি দিয়ে নদের চাঁদকে হত্যা করতে। একদিকে পালক পিতার নির্দশ,অপর দিকে স্বামীর প্রতি প্রেম; এই উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় অক্ষম মহুয়া কিছু বুঝে উঠতে পারে না যে কি করবে।তখন সে চিৎকার করে বলে ওঠে -

" কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি।
খাড়া থাকো বাপ তুমি আমি আগে মরি"।।[৫]

এই বলে মহুয়া নিজের বুকে সেই বিষছুরি বসিয়ে মৃত্যু বরণ করে। মহুয়ার মৃত্যু দেখে সহ্য করতে না পেরে তাঁর স্বামী নদের চাঁদও মৃত্যু বরন করে।তাদের মৃত্যুর পর হুমরা তার ভুল বুঝতে পারে। তাদের দুজনকে একই কবরে মাটিচাপা দেওয়া হয়।

এখানে তাদের দৈহিক বিচ্ছেদ দেখানো হলেও,মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে প্রেমের জয়কে দেখানো হয়েছে।

'মলুয়া' পালায় চাঁদ বিনোদ ও মলুয়ার প্রেমভাবনা এবং মলুয়ার আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে তাদের বিচ্ছেদের চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথমে আমার দেখি চাঁদ বিনোদের ফসল নস্ট হয়ে যায়।যার ফলে চাঁদ বিনোদ মায়ের অনুমতি নিয়ে কুড়া শিকারে বেরিয়ে যায়। কুড়া শিকারে ক্লান্ত হয়ে আড়ালিয়া গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে একটি পুকুর পাড়ে এসে ক্লান্তি বসত ঘুমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা হয়ে এলেও চাঁদ বিনোদ তখনও ঘুমে আচ্ছন্ন। এমন সময় জল ভরতে ঘাটে এলো সুন্দরী নায়িকা মলুয়া।নিদ্রিত চাঁদ বিনোদকে দেখে মলুয়ার মনে গভীর প্রেম সঞ্চার হলো। যার ফলে মলুয়া কৌশলের আশ্রয় নিল এবং কলসি নিয়ে জলের উপর ঢেউ দিতে লাগলো যাতে করে তার ঘুম ভাঙে।এদিকে জেগে উঠেই সুন্দরী কন্যাকে দেখে চাঁদ বিনোদের মনে হলো সে যেন নিশি স্বপ্ন দেখছে।এরপরেই মলুয়ার প্রেমপূর্ণ মনের পরিচয় এঁকেছেন কবি-

" ভিনদেশী পুরুষ দেখি চান্দে মতন।
লাজ-রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন"।।[৬]

উভয়ের এই পূর্বরাগের সুচনারুপে চাঁদ বিনোদ তার মনের কথা দিদিকে গিয়ে বলল।বিনোদের দিদি সব কথা শোনার পর তার মাকে বললো এবং বিনোদের মা ঘটক পাঠালো মলুয়ার বাড়ি। মলুয়ার বাবা দুঃখপীড়িত সংসারে কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হলেন না। এরপর বিদেশ থেকে অনেক উপার্জন করে এসে মলুয়াকে বিবাহ করলো এবং সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো। এখানে কবি তাদের মিলনের মধ্যে দিয়ে প্রেমভাবনা তুলে ধরেছেন।

বেশ সুখেই তাদের দিন অতিবাহিত হচ্ছিল হঠাৎ দুঃখের মেঘ ঘনিয়ে এলো। একদিন দেশের কাজী স্নানের ঘটে মলুয়াকে দেখে, তার মনে মলুয়াকে পাবার কামনা

জাগে ওঠে। যার জন্য কাজী নানা ষড়যন্ত্র করতে লাগলো যাতে সে মলুয়াকে পাই।নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে চাঁদ বিনোদ ও মলুয়ার বিচ্ছেদের সূত্রপাত ঘটে। দুর্বৃত্ত কাজীর ষড়যন্ত্রে বিনোদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। মলুয়া তার সোনার অলংকার বিক্রি করে সংসার চালাতে লাগলো। এই দুঃখ কষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে বিনোদ কাউকে না জানিয়ে ধন উপার্জনের জন্য শহরে চলে যায়। এখানে তাদের সাময়িক সময়ের জন্য বিচ্ছেদকে দেখানো হয়েছে।

এরপর মলুয়ার মা পাঁচ পুত্রকে পাঠান তাকে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু দুঃখিনী মলুয়া স্বামীর ভিটা ত্যাগ করল না।ইতিমধ্যে ধনোপার্জন করে বিনোদ বাড়ি ফিরলে আবার বিনোদ- মলুয়ার সুখের দিন এলো। কিন্তু এ সুখ বেশি দিন টিকলো না। আবার কাজীর চক্রান্তে বিনোদের উপর পরওয়ানা জারী হল। যার ফলে বিনোদকে ধরে নিয়ে যায় মৃত্যু দণ্ড দেওয়ার জন্য। মলুয়া কোড়ার মারফৎ পাঁচ ভাইয়ের কাছে সমস্ত সংবাদ জানিয়ে চিঠি দিল।ভাইয়েরা সেই চিঠি পেয়ে বিনোদকে উদ্ধার করে এবং বাড়ি ফিরে এসে দেখে কাজীর লোক মলুয়াকে তুলে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা অসম্ভব দেখে, মনের দুঃখে মা কে নিয়ে বিনোদ দেশান্তরী হল।

এরপর মলুয়া সেখান থেকে নিজের বুদ্ধি ও কৌশল দিয়ে নিজেকে রক্ষা করে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ মলুয়ার চোখের জলের মূল্য দিল না।মুসলমানের গৃহে ছিল বলে তাকে ত্যাগ করার পরামর্শ দিল আত্মীয়রা। কিন্তু বাইর কামুলীর কাজ করে মলুয়া স্বামীর ভিটা আঁকড়ে রইল। ওদিকে বিনোদ পুনরায় বিবাহ করলো। তারপর বিনোদ কোড়া শিকারে গেলে কালসাপে দংশন করল তাকে।মলুয়া মৃতপ্রায় স্বামীকে নিয়ে ওঝার বাড়ি গেল। ওঝা বিষ নামিয়ে দিলে বিনোদ পুর্নজীবিত হল।অনেকেই তখন মলুয়াকে পুর্নগ্রহণের জন্য অনেকে বলল,কিন্তু জাতিবর্গের প্রবল আপত্তিতে বিনোদ তা পারলো না।এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে কবি তাদের বিচ্ছেদকে তুলে ধরেছেন।

শেষপর্যন্ত আমরা দেখি মলুয়া তার জীবন বিসর্জন দিয়ে তার জীবন বিসর্জন দিয়ে তাঁর সতীত্ব ও প্রেমভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি উক্তি স্মরণীয় -

" উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও।

অভাগীরে রাইখ্যা তুমি আপন ঘরে যাও"।।[৭]

মলুয়ার প্রেম এত পবিত্র ছিল যে,সে জানতো আত্মবিসর্জন না করলে তাঁর স্বামীর কলঙ্কমোচন কোনদিনই হবে না।তাই সে তার নিজের জীবন দিয়ে তাঁর প্রেমকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এখানে তার প্রেমকে দেখানো হয়েছে।

'চন্দ্রাবতী' পালাটি নয়ন চাঁদ ঘোষ প্রনীত। এই পালায় চন্দ্রাবতী চরিত্র ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু নয়নচাঁদ রচিত এই গীতিকাটিতে তাঁর জীবনের করুন কাহিনি বর্ণিত।

চন্দ্রাবতী পিতার শিবপূজার জন্য প্রতিদিন যে পুষ্পচয়ন করতো ; সেই পুষ্পচয়নে নিয়ত সাহায্যকারী হিসেবে ডাল নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ।এইভাবে বাল্যসহচর্যে প্রেম সঞ্চারিত হল।একদিন জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে একটি পত্রের মধ্যে দিয়ে তার প্রেমের কথা জানালো-

"যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্দবদন।

সেইদিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন"।।[৮]

এইভাবে তাদের প্রেমের শুরু হয়।কিন্তু চন্দ্রাবতী এই চিঠির উত্তর দিতে পারে না।ইতিমধ্যে ঘটক এসে জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিবাহের প্রস্তাব দিল।চন্দ্রাবতীর পিতা সমন্ধটি স্থির করে ফেললেন।বিবাহের আয়োজন যখন জোড়তোড় করে চলছে তখন জয়ানন্দ এক যবনীর রুপে মত্ত হলো, এবং তাকে নিয়ে পালিয়ে গেল।এখানে জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর বিচ্ছেদ কে দেখানো হয়েছে।

এই শোক থেকে নিবারণ পাওয়ার জন্য চন্দ্রাবতীর পিতা তাকে শিবপূজা ও রামায়ণ রচনা করতে উপদেশ দিলেন। কিছুদিন পরেই জয়ানন্দ তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে। এসে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পত্র লিখল। চন্দ্রা পিতাকে এ কথা জানালে পিতা তাকে বিচলিত হতে বারণ করলেন। চন্দ্রাবতী তখন দরজায় কপাট দিয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন। এদিকে জয়ানন্দ এসে দরজার বাইরে

দাঁড়িয়ে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বহু সাধ্য- সাধনা করলো, কিন্তু ব্যার্থ হল এবং কপাটে তার জন্য বার্তা লিখিল-

"শাশিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলে সম্মত।
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মতো"।।[৯]

এরপর জয়ানন্দ নদীর জলে প্রান বিসর্জন করলো। ধ্যান থেকে জাগ্রত হয়ে চন্দ্রাবতী কপাটের লেখা দেখতে পেল,এবং যবনস্পৃষ্ট হয়ে মন্দির অপবিত্র হয়েছে বলে নদীতে তর্পন করতে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে নদী উজানতালে বয়ছে,আর জয়ানন্দের দেহ ভাসছে সেই নদীর উপর। এ প্রসঙ্গে পালাকার বর্ণনা দিয়েছেন -

"একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাহি কেহ।
জলের উপরে ভাসে জয়ানন্দের দেহ"।।[১০]

এই উক্তির মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন সারাজীবনের মতো চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের বিচ্ছেদ কে দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি আবার দেখানো হয়েছে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে জয়ানন্দের প্রেম বিলুপ্ত হয়নি,যেটা জয়ানন্দ তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে চন্দ্রাবতীকে।

তৃতীয় অধ্যায়

(সুনাই এবং মদিনা ; নায়িকাদ্বয়ের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে প্রেম ও সতীত্ব রক্ষা)

লক্ষ্য করে দেখলে আমরা দেখতে পায় পালাগুলিতে নারীর প্রেমের জয় – জয়কার ঘোষিত হয়েছে।প্রেম ও সতীত্ব রক্ষার জন্য মলুয়া যেমন আত্মত্যাগ করেছিল। তেমনি সুনাই ও মদিনা প্রেমাস্পদের জন্য আত্মবলিদান দিয়ে নারী ধর্মের দ্বীপশিখাটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

'দেওয়ান ভাবনা' পালাটি শুরু হয়েছে সুনাই এর বাল্যকালের বর্ণণার মধ্যে দিয়ে। ছেলেবেলাটা সুনাইয়ের খুব হেসেখেলেই কাটছিল। তার বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপসৌন্দর্যও বিকশিত হয়ে উঠছিল, এবং সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে বাপ- মায়ের খুব সুখেই দিন কাটছিল।কিন্তু সুনাইয়ের যখন দশ বছর বয়স তখন তার বাবার অকাল মৃত্যু ঘটলো। তাই সুনাইকে নিয়ে তার মা অনেক ভেবেচিন্তে তাঁর নিঃসন্তান যজমান ভায়ের কাছে আশ্রয় নেন।মামা- মামী দুজনেই সুনাইকে পরম আদরে গ্রহণ করে। বিয়ের বয়স হলে তাকে পাত্রস্থ করার জন্য অনেক ঘটকের আনাগোনা হয়।কিন্তু তার মায়ের মন কিছুতেই ওঠে না।তিনি চান কূলে দীর্ঘ- বংশ,উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সোনার কার্ত্তিকের মতো জামাই।

এদিকে পথে একদিন সুনাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় মাধবের।প্রথম দেখাতেই উভয় উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়।মাধব জমিদারের সন্তান তাই সকল ধন দৌলতের বিনিময়ে চায় তার যৌবন। কিন্তু মাধবের প্রতি আকৃষ্ট হলেও সুনাই তায় সহজাত বোধ- বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেনি।তাই সে পরাণের বন্ধুকে জানিয়ে দেয় বিয়ের ব্যাপারে মা আর মামার সঙ্গে কথা বলতে।এখানে আমরা সুনাইয়ের বিচক্ষণতার পরিচয় পাই।এদিকে বাঘরা দেওয়ান ভাবনার কাছে সুনাইয়ের সংবাদ পৌঁছে দেয়। দেওয়ান ভাবনা বাঘরার মাধ্যমে সুনাইয়ের মামাকে জমির লোভ দেখিয়ে সুনাইকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। সুনাই সব কথা মল্লীদূতীর মারফত পত্র লিখে মাধবকে তার বিপদের কথা জানাই,এবং তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে। মাধব দূতীর মাধ্যমে খবর পাঠায় সুনাই যেন সন্ধ্যাবেলায় জলের ঘাটে আসে,তাহলে সে তার নৌকায় সুনাইকে তুলে নিয়ে আসতে পারবে।কিন্তু দর্ভাগ্যক্রমে ঘাটের কেয়াবনের আড়ালে দেওয়ান ভাবনার

নৌকা আগে থেকেই বাঁধা দিল। সুনাইকে সেই নৌকায় জোর করে তুলে নেওয়া হয়। দেওয়ান ভাবনার নৌকায় সুনাইকে বিলাপ করতে দেখে, সেই নৌকার ছিদ্র নেয় মাধব এবং মাঝিমল্লারকে মেরে সুনাইকে উদ্ধার করে ও বিয়ে করে।

কিন্তু এ সুখ তার কপালে বেশি দিন সয়না।মাধবের বাবাকে দেওয়ান ভাবনা তুলে নিয়ে যায়।মাধব বাবার খোঁজে গৃহত্যাগ করে।সুনাইয়ের জীবনে শুরু হয় দুঃখের বারো মাসের কাহিনি। আষাঢ় থেকে জ্যৈষ্ঠ নানান দুঃখের মধ্যে দিয়ে কাল অতিবাহিত করার পর হঠাৎ একদিন মাধবের বাবা ফিরে আসে। তিনি সুনাইয়ের কাছে এই আবেদন রাখেন,যে মাধব তার একমাত্র পুত্র। সুনাইয়ের জন্য দেওয়ান তাকে আটকে রেখেছে। এখন যদি সুনাই দেওয়ানের কাছে ধরা দেয় তবেই মাধব মুক্তি পেতে পারে।সুনাইয়ের জীবনে এ এক মহা সংকটের সময় কাল।একদিকে প্রেমাস্পদের জীবন অন্যদিকে নিজের সতীত্ব রক্ষা।এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষত- বিক্ষত সুনাই অবশেষে বিশেষ নাড়ু শিখে দেওয়ানের কাছে উপস্থিত হয়। প্রথমে সে মাধবকে সে কেড়ে দেওয়ার কথা বলে দেওয়ানকে।মাধবকে মুক্তি দেওয়ার পর মাধব চলে গেলে সুনাই বিয়ের নাড়ু খেয়ে আত্মহত্যা করে। এপ্রসঙ্গে একটি উক্তি স্মরণীয় -

"দুর্জন দুষমন ভাবনার আগে না পুরিল।

গ্রাম বন্ধুরে বাঁচাইতে সুনাই পরাণে মরিল"।।[১]

সুনাইয়ের আত্মহত্যা শুধু সতীত্ব রক্ষার জন্য নয়; এ পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে এক প্রবল আঘাতও বটে।যে সমাজ বংশের একমাত্র ছেলেকে রক্ষার জন্য ঘরের বৌকে বিকিয়ে দিতে কুন্ঠাবোধ করে না,সে সমাজে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার তাৎপর্য আর খুঁজে পাইনি সুনাই।তাই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সে তার প্রতিবাদের ধ্বনি প্রকাশ করেছে।

একইভাবে 'দেওয়ানা মদিনা' পালায় মদিনা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনের উজ্জ্বল ট্রাজেডি দেখানো হয়েছে। মদিনা চরিত্রের প্রধান এবং একমাত্র বৈশিষ্ট্য

পতিপ্রেম।সে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি স্বামী তাকে পরিত্যাগ করতে পারে।তাই স্বামী দুলালের তালাকনামা পেয়ে সে ভেবেছে এটা স্বামীর পরিক্ষামাত্র।তাই হেসে সে বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছে।কিন্তু দুলাল তালাকনামা পাঠিয়ে আর ফিরে আসে না।দিনের পর দিন যায়, কিন্তু তবুও মদিনা আবিশ্বাস করেনা তার স্বামীকে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস দুলাল একদিন ফিরে আসবেই। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই মদিনা অপেক্ষা করে। স্বামীর প্রিয় খাদ্যগুলি করে রাখে।এভাবে কেটে যায় দুটি মাস।তখন মদিনা তার ভাই ও শিশু পুত্রকে স্বামীর খুঁজে পাঠায়।তারা সব জেনে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলে মদিনা এক কঠিন সত্যের সম্মুখীন হতে হয়।মদিনার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করলেও মদিনা কখনও স্বামীকে দোষ দেয়নি।দোষ দিয়েছে নিজের কপালকে।এখানেই প্রেমের মহত্ব।

মদিনা অবশ্য বুঝতে পারে না তার দোষ কোথায়! সে তো কখনও স্বামীকে অবহেলা করেনি; কিংবা স্বামীর সেবায় ত্রুটি রাখেনি। মাঘ মাসের দারুণ শীতে সে স্বামীর জন্য আগুন জ্বেলে দিত।স্বামী যখন ক্ষেতে যেত তখন সে অধীরে অপেক্ষা করে থাকতো। তবুও তার জীবনে এ বিড়ম্বনা কেন? এ তার কপালের লিখন। তাই সে প্রবল আক্ষেপ করে বলে-

"মদিনা কান্দয়ে 'আল্লা' কি লেখছ কপালে।

বনের পংখী আইলা যেমন উইড়া গেলে চইলে"।।[২]

অবশেষে স্বামী বিরহে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিশেষ ঘটে।

সুনাই যেমন তাঁর আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে শুধু প্রেম ও সতীত্বই রক্ষা করেনি,বরং তৎকালীন সমাজের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে এক প্রবল ইঙ্গিত করেছেন। তেমনি একজন লোভী পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার কাছে এবং ভাগ্যের কাছে পরাজিত এই শরীর ট্রাজেডি সত্যই আমাদের আপ্লুত করেছে। এবং পতিভক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রতিক হয়ে উঠেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

(মৈমনসিংহ গীতিকায় নারীবেদনার অন্তরালে পুরুষ মনস্তত্ত্ব)

মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলি অপ্রতিরোধ্য লৌকিক প্রেম ও তাদের উপর দিয়ে যে ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলিকে নিয়েই রচিত হয়েছে গীতিকাটি।প্রতিটি পালায় আমরা দেখি প্রেমকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করেছে নারীরা। তাদেরকে যে শুধু দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাই নয়, এই দুঃখের পিছনে পুরুষ বা নায়ক চরিত্রগুলো যে কতখানি দায়ী সেগুলো আমরা লক্ষ্য করেছি।

মহুয়া পালায় মলুয়াকে অনেক বাঁধা – বিপত্তি পার করতে হয়েছে তাদের প্রেমকে টিকিয়ে রাখার জন্য। অনেক কষ্ট সহ্য করে শেষ পর্যন্ত তাদের দুজনের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মিলন ঘটেছে দুজনের। কিন্তু এই দুঃখের পিছনে অল্প কিছু হলেও দায়ী ছিলেন নদের চাঁদ। কেননা মহুয়াকে ভালোবেসে সুখে ঘর বাঁধার স্বপ্ন না দেখালে হয়তো তাদেরকে কষ্ট সহ্য করতেই হত না।

মলুয়া পালায় আমরা দেখি মলুয়াকে চান্দ বিনোদের পছন্দ হওয়ার সে ফিরে এসে তার দিদিকে জানায় মলুয়ার কথা ।তার দিদি সব কথা শোনার পর তার মাকে বললো এবং বিনোদের মা ঘটক পাঠালো মলুয়ার বাবার কাছে। চান্দ বিনোদ কিছু রোজগার না করার ফলে মলুয়ার বাবা তার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হননি। এরপর রোজগার করতে বাইরে যায় বিনোদ। রোজগার করে এসে মলুয়াকে বিয়ে করে এবং তারা সুখে সংসার করতে আরম্ভ করে।কিন্তু কাজীর কুদৃষ্টি মলুয়ার উপর পড়ার ফলে, চান্দ বিনোদের উপর কর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যায় ফলে চান্দ বিনোদ কাউকে কিছু না জানিয়ে ধন উপার্জনের জন্য শহরে চলে যায়। যার ফলে মলুয়ার দুঃখের শেষ থাকে না।এখানে আমরা দেখি জেনে না জেনেও মলুয়ার দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় চান্দ বিনোদ।

এছাড়াও আবার দেখি কাজীর চক্রান্তে মলুয়াকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় দেওয়ান সাহেবের বাড়িতে।সেখানে মলুয়া তার বুদ্ধির জোরে নিজেকে রক্ষা করে ও সেখান থেকে চলে আসে তার স্বামীর বাড়িতে। কিন্তু সমাজের চাপে পড়ে মলুয়া স্বামীর ঘরে স্থান পায় না। সে বাড়ির বাইরে থেকে যায় তবুও স্বামীর ভিটা ত্যাগ করে না। একদিন বিনোদকে সাপে কামড়াই, তখন মলুয়া ওঝার বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে সুস্থ

করে তোলে। কিন্তু তবুও বিনোদের পিসেমশাই তাকে ঘরে তুলতে চাই না। মলুয়া চিরদুঃখিনী রয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে একটি উক্তি স্মরণীয় -

"বিনোদের পিশা কয় ভাবিয়া চিন্তিয়া।

ঘরেতে না লইব কন্যা জাতিধর্ম ছাড়িয়া"।।[১]

যে প্রেমের জন্য মলুয়া এত দুঃখ সইলো সেই প্রেমও শেষ পর্যন্ত সমাজের লোকের কটুবাক্যকে প্রাধান্য দিয়েছে। নিজের প্রেমের মানুষটাকে ঘরে না তুলে তার দুঃখের কারণ হয়েছে। -

"দুঃখিনী দুঃখের কন্যা দুঃখে দিন যায়।

এত দুঃখ ছিল তার কইতে না যোয়ায়"।।[২]

চন্দ্রাবতী পালাতেও জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে প্রেম নিবেদন করে। দুজনের মধ্যে প্রেম শুরু হয় ও তাদের বাড়ি থেকে বিয়েও ঠিক করে। কিন্তু জয়ানন্দ এক মুসলীনির প্রতি আসক্ত হয়ে সেই মুসলীনিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। যায় ফলে চন্দ্রাবতীর একমাত্র দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় জয়ানন্দ।চন্দ্রবতী পাষানের মতো আচরণ করে।

"না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী।

আছিল সুন্দরী কন্যা হইলো পাষাণী"।।[৩]

শুধুমাত্র জয়ানন্দের কারণে সুস্থ সবল চন্দ্রাবতীর মন পাষাণের মতো হয়ে যায়।

দেওয়ান ভাবনা পালাতেও সুনাইয়ের রুপ দেখে দেওয়ান ভাবনা তাকে পেতে চাইলো এবং সুনাইকে তাদের নৌকায় জোর করে তুলে নিয়ে গেল। সেখান থেকে মাধব সুনাইকে উদ্ধার করে ও বিয়ে করে। বিয়ের পর দেওয়ান মাধবের বাবাকে বন্দি করে, যার ফলে মাধব তার বাবাকে খুঁজতে বার হয়।আষাঢ় মাসে বেরিয়ে গিয়ে জ্যেষ্ঠ মাস পর্যন্ত তার দেখা পাওয়া যায় না। এদিকে বিয়ের পরে পরেই দুঃখের জীবন শুরু হয় সুনাইয়ের। যেটা প্রায় বারো মাস ধরে নানান ঝড় ঝঞ্জার মধ্যে দিয়ে

উপভোগ করতে হয়।এরপর মাধবের বাবা ফিরে এসে মাধবের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সুনাইকে দেওয়ানের কাছে যেতে বলে। সুনাই মাধবকে বাঁচিয়ে নিজের সতীত্ব রক্ষার তাগিদে আত্মবিসর্জন করে।

দেওয়ানা মদিনাতে আমরা দেখি যে মদিনা দুলালকে বেঁচে থাকতে শিখিয়ে ছিল, তাকে সুখের সন্ধান দিয়েছিল। দুলালকে বিয়ে করে তাকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছিল। মদিনা স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিল। কিন্তু একদিন দুলাল দাদার কুপরামর্শে মদিনাকে তালাক দিয়ে চলে যায়। যার পর থেকে মদিনার দুঃখের শেষ রইল না।

"কান্দিয়া কান্দিয়া বিবির দুঃখে দিন যায়।
খানাপিনা ছাড়্যা কেবল করে 'হায় হায়'।।[৪]

পালাগুলি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পায়, প্রতিটি পালায় নারীদের বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরুষ মনস্তত্ত্ব অর্থাৎ পুরুষ চরিত্র। যার ফলে প্রতিটি পালাতেই দেখি নারীদের প্রচুর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। নারীদের বেদনার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরুষ।

উপসংহার

মৈমনসিংহ গীতিকার যে উপজীব্য বিষয় এবং এর যা দৃষ্টিভঙ্গি তাতে ইহাকে আধুনিক মানের সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো বাঁধা নেই।এই গীতিকার প্রতিটি পালার প্রাণশক্তি হল নারী।তাই নারীদেরকে ঘিরে সমস্ত পালাগুলি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। শুধু তাই নয় পল্লী প্রকৃতিকে নিয়েও অনেক গাঁথা রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এই গীতিকাগুলির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে লিখেছেন – "পল্লীগ্রামের পথে কানাকড়ি খুঁজিতে গিয়ে যেন আমি স্বর্ণমুদ্রার ভান্ডার পাইয়াছি।আশ্চর্যের বিষয় আমরা জানি না যে বঙ্গদেশের পল্লী – লক্ষ্মী এইরুপ শত শত রত্ন তাহার অঞ্চলে কুড়াইয়া রাখিয়াছেন"।।

গীতিকার নায়িকারা সকলেই প্রায় এক,কিন্তু প্রকৃতিতে তারা ভিন্ন ভিন্ন। এদের মধ্যে প্রায় জনই কুমারী, কিশোরী। তাই অনুরাগের অঞ্চলে সকলেই প্রেমনিষ্ঠাবতী।আমরা দেখি তাদের প্রেম কখনও বা পল্লী প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কখনও বা তারা নিজেরাই ব্যক্ত করেছে।কোথাও বা দেখানো হয়েছে তাদের প্রেম সার্থক করতে নায়করা তাদের সঙ্গী হয়েছে, কোথাও বা দেখানো হয়েছে নায়িকাদের দুঃখের পিছনে নায়ক চরিত্র গুলো কতখানি দায়ী। সুতরাং আমরা বলতে পারি দীনেশচন্দ্র সেনের মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলি সংগ্রহের পর,সেই পালাগুলির কবিদের দ্বারা খুব সুন্দর ভাবে প্রকৃতি, নারী,পুরুষ ও নারীপুরুষদের মধ্যে প্রেম বিচ্ছেদের ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রজ্ঞাবিকাশ,৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা – ৭০০ ০০৯, পুণর্মুদ্রণ: এপ্রিল ২০২২,পৃষ্ঠা- ৩২৩.

২. তদেব,পৃষ্ঠা- ৩৬

৩. তদেব,পৃষ্ঠা- ৩৭

৪. তদেব,পৃষ্ঠা- ৪০

৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫০

৬. তদেব,পৃষ্ঠা- ৬০

৭. তদেব, পৃষ্ঠা – ৭০

৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১০৯

৯. তদেব, পৃষ্ঠা – ১১২

১০. তদেব, পৃষ্ঠা -১২৪

১১. তদেব, পৃষ্ঠা -২৪৭

১২. তদেব, পৃষ্ঠা -৩২৩

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা -১০৭

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা -১২০

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩২৪

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ

১. সেন দীনেশচন্দ্র, মৈমনসিংহ-গীতিকা, প্রজ্ঞাবিকাশ, পুনর্মুদ্রণ: এপ্রিল ২০২২

সহায়ক গ্রন্থ

১. বন্দোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস(দ্বিতীয় খণ্ড), মর্ডান বুক এজেন্সি ২০১৪-১৫

২. চট্টপাধ্যায় মুনমুন,মৈমনসিংহ গীতিকা পুনর্বিচার,কলকাতা বইমেলা ২০০৩.

৩. চট্টপাধ্যায় কেয়া,মৈমনসিংহ গীতিকা নব আলেখ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ২০১৫.

৪. চট্টপাধ্যায় তপন কুমার, আদি-মধ্য – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ ২০১৬.

আন্তর্জাতিক সূত্রে প্রাপ্ত সহায়তা

১. https// www.Banglapedia. Com

২. https // bn.m.Wikipedia. org

৩. https// granthagara.com.(pdf)